بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪৭-১০/০২ বৃহস্পতিবার, ১৬ রমজান, ১৪৪৭ ০৫/০৩/২০২৬ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بسم الله الرحمن الرحيم

বাণিজ্য চুক্তির আড়ালে সম্পাদিত মার্কিন উপনিবেশবাদী প্রকল্পকে রুখতে, দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে

মঙ্গলবার রাতে মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুরের ঢাকা আগমনকে ঘিরে দেশের কৌশলগত ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এক মাস না পেরোতেই এই উচ্চপর্যায়ের সফরটি মূলত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী লবিংয়ের বহিঃপ্রকাশ- যার লক্ষ্য হলো বিতর্কিত দুটি প্রতিরক্ষা চুক্তি: 'জেনারেল সিকিউরিটি অফ মিলিটারি ইনফরমেশন এগ্রিমেন্ট' (GSOMIA) এবং 'অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ক্রস-সার্ভিসিং এগ্রিমেন্ট' (ACSA) দ্রুত কার্যকর করা। এই ধরণের সফরগুলোকে নিছক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা স্রেফ ভণ্ডামি কিংবা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে তথাকথিত "রুটিন" প্রতিরক্ষা চুক্তিগুলো নিয়ে "দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপ" গ্রহণের প্রত্যাশার কথা বলা হলেও, এই কূটনৈতিক ভাষার আড়ালে লুকিয়ে আছে দেশের সার্বভৌমত্বের উপর এক গভীর ও উদ্বেগজনক হুমকি। GSOMIA স্বাক্ষরিত হলে আমাদের সামরিক স্থাপনাগুলো বিদেশি নজরদারির আওতায় চলে যাবে, আর ACSA কার্যকর হলে দেশের ভূখণ্ডকে কার্যত একটি অঘোষিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করার পথ খুলে যাবে। এতে মার্কিন অস্ত্রের উপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে দেশকে কৌশলগতভাবে এক ধরনের ফাঁদে আবদ্ধ করে ফেলা হবে।

কাপুরের সফরের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হলো, নতুন বিএনপি সরকারকে আলোচনার কোনো সুযোগ না দিয়ে অবিলম্বে এই চুক্তিগুলো সম্পাদনে বাধ্য করা। নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন আগে, গত ৯ই ফেব্রুয়ারি অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে এবং তড়িঘড়ি করে একটি সর্বনাশা বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করা হয়, যার ধারাবাহিকতায় এখন এই সামরিক চুক্তির চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই আত্মঘাতী চুক্তি বাংলাদেশকে বেশ কিছু কঠোর শর্তের বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলেছে। এই শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে: "মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থী" হতে পারে এমন কোনো ডিজিটাল বাণিজ্য চুক্তি নিষিদ্ধ করা, চীন বা রাশিয়ার মতো নন-মার্কেট (non-market) অর্থনীতিভুক্ত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের চুক্তি বাতিল করার ক্ষমতা ওয়াশিংটনকে প্রদান করা, এবং ১৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের মার্কিন এলএনজি (LNG), বোয়িং বিমান, ও কৃষিপণ্য আমদানির বাধ্যবাধকতা- যা মূলত আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে কার্যত মার্কিন কর্পোরেট স্বার্থের কাছে জিম্মি করে ফেলছে। আর একটি 'নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট (NDA)' বা গোপনীয়তা চুক্তির মাধ্যমে পুরো বিষয়টি সম্পর্কে জনগণকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে।

তাছাড়া, কাপুরের সফরের সময়কাল ও সফরসূচিই অনেক কিছুর ইঙ্গিত দেয়। ঢাকায় আসার আগে তার নয়াদিল্লি সফর স্পষ্ট করে, ওয়াশিংটন তার ইন্দো-প্যাসিফিক ভূরাজনৈতিক স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে নতুনভাবে সাজাতে চায়। এতে এক বিপজ্জনক আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, অর্থাৎ বাংলাদেশ আবারও যুক্তরাষ্ট্র-ভারত এবং চীনের মধ্যকার ভূরাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে আটকা পড়তে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে হাসিনা আমলের সেই বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তির ঝুঁকিই দেখা দিচ্ছে, যখন মার্কিন-ভারতের স্বার্থ রক্ষার কারণে এই ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্বকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।

বিএনপি সরকারকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে, তারা যেন বৃহৎ শক্তিগুলোর ক্ষমতার দ্বন্দ্বের বলির পাঁঠা না হয়- যার সাথে আমাদের স্বার্থগত কোনো সম্পর্কই নেই। তাই কাপুরের সঙ্গে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত আলোচনায় সর্বোচ্চ সতর্কতা ও দূরদর্শিতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। বিশেষ করে যখন তার এজেন্ডায় "সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা" বিষয়টি সামনে আনা হয়েছে, তখন সরকারকে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে। কারণ নিরাপত্তা সহযোগিতার নামে যেন কোনোভাবেই বিদেশি শক্তির নির্দেশনায় ইসলামী ব্যক্তিত্ব, আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের পথ তৈরি না হয়। বিগত সরকারের সেই ভয়াবহ ভুলের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে, যা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম নিকৃষ্ট স্বৈরাচারে পরিণত করেছিল।

আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আমাদের শাসকদের এই ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করতে হবে যে ক্ষমতায় টিকে থাকা কেবল ওয়াশিংটনের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। কারণ, মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ও অনিশ্চিত: ইরানের সাথে চলমান সংঘাতের

প্রেক্ষাপটে একজন ঊর্ধ্বতন সৌদি কর্মকর্তার বক্তব্যেও এর প্রমাণ মেলে। যিনি বলেছেন, ইসরায়েলকে রক্ষা করতে গিয়ে ওয়াশিংটন তার উপসাগরীয় মিত্রদেরও ত্যাগ করেছে যারা নিজেদের দেশে স্থায়ীভাবে মার্কিন ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ দিয়েছে। ইতিহাসের পাতায় বারবার এই একই সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়: সাদ্দাম হোসেন, হোসনি মোবারক, কিংবা বাংলাদেশের বিগত শাসকগোষ্ঠী- সকলেই মার্কিন স্বার্থ রক্ষায় বিশ্বস্তভাবে কাজ করার পরেও 'টিস্যু পেপারের' মতো পরিত্যক্ত হয়েছে। এমনকি ইরানের নেতৃত্বও বছরের পর বছর ধরে মার্কিন কৌশলগত লক্ষ্যের সাথে তাল মিলিয়ে চলার পর আজ নিজেদেরকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে। সরকারকে অবশ্যই পশ্চিমা আধিপত্যবাদের হাতিয়ার বা প্রক্সি হয়ে কাজ করাকে অস্বীকৃতি জানাতে হবে- যে আধিপত্যবাদ আমাদের বোঝাতে চায়, তাদের প্রভাববলয় থেকে মুক্তি পাওয়া নাকি অসম্ভব। প্রকৃত সার্বভৌমত্বের জন্য এমন নেতৃত্ব প্রয়োজন যারা ওয়াশিংটনের রক্তচক্ষুকে নয়, বরং আল্লাহ্ ﷻ ও জনগণের আমানতকে ভয় করেন; এবং যাদের মূল শক্তি কোনো বিদেশি দূতাবাস নয়, বরং এ দেশের জনগণ। আল্লাহ্ ﷻ পবিত্র কুর'আন-এ বলেন:

إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا۟ لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ

"তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে, তারা তোমাদের শত্রু হবে এবং অনিষ্ট সাধন করার উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি তাদের হস্ত ও রসনাসমূহ প্রসারিত করবে, এবং তারা চাইবে যে তোমরাও যেন কাফির হয়ে যাও" [সূরা আল-মুমতাহানাহ: ২]

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিস